বউ-চণ্ডীর মাঠ

(গল্পগ্রন্থ – মেঘমল্লার)

গ্রামের বাঁওড়ের মধ্যে নৌকো ঢুকেই জল-ঝাঁঝির দামে আটকে গেল।

কানুনগো হেমেনবাবু বললেন—বাব্‌লা গাছটার গায়ে কাছি জড়িয়ে বেঁধে নাও...

বাইরের নদীতে ভাটার টান ধরেছে, নাটা-কাঁটার ঝোপের নীচের জল স'রে গিয়ে একটু একটু ক'রে কাদা বার হচ্ছে।

হেমেনবাবু বললেন—একটুখানি নেমে দেখবেন না কোথায় পিন ফেলা হয়েছে ? যত শীগ্‌গির খানাপুরীটা শেষ হয়ে যায়....

এমন সুন্দর বিকালটাতে আর কাজ করতে ইচ্ছা হল না। পিছনের নৌকো থেকে লোকজনেরা নেমে জায়গা ঠিক ক'রে সেখানে তাঁবু ফেলবে। জরিপের বড় সাহেবের শীগ্‌গির সদর থেকে আসবার কথা আছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হয়, সকলের সেই দিকে ঝোঁক। সাব ডেপুটি নৃপেনবাবু কাজ শেখবার জন্যে এইবার প্রথম খানাপুরীর কাজে এসেছিলেন। বয়স বেশী না, ছোকরা—কিন্তু মাঝনদীতে নৌকা দুললেই তাঁর অত্যন্ত ভয়। হচ্ছিল। বোধ হয় ভয়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই তিনি এতক্ষণ ছই-এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বার ভান ক'রে শুয়েছিলেন—এবার ডাঙ্গায় নৌকা লাগাতে তিনি ছই-এর ভেতর থেকে বার হয়ে এলেন এবং একটু পরে হেমেনবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় কি নিয়ে বেশ একটু তর্ক শুরু করলেন।

নৃপেনবাবুকে বললুম-Tenancy Act-কচ্‌কচিতে আর দরকার নেই, তার চেয়ে বরং চলুন নেমে তাঁবুর জায়গা ঠিক করা যাক—কাল সকালেই যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়....

চৈত্র মাস যায় যায়। গ্রাম্য নদীটির দু'পাড় ভ'রে সবুজ সবুজ লতানো গাছে নীল-পাপড়ি বন-অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে। বাঁশ-ঝাড় কোথাও জলের ধারে নত হয়ে পড়েছে, তলায় আকন্দ ঘেঁটু ফুলের বন ফুলের ডালি মাথায় নিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দু'ধারের রোদ-পোড়া কটা ঘাসওয়ালা মাঠের মাঝে মাঝে পত্র-বিরল বাব্‌লা গাছে গাঙশালিকের ঝাঁক কিচ্ কিচ্ কচ্ছে—নদীর বাঁ পাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে তাদের বাসা। মাকাল-লতায় ঝোপের তলায় জলের ধারে কোথাও উঁচু উঁচু বনমূলোর ঝাড়, তাদের কুচো কুচো হলদে ফুল থেকে জায়ফলের মত একটা ঘন গন্ধ উঠছে।

বেলা আর একটু পড়লে আমরা সেই বাঁওড়ের ধারের মাঠে তাঁবুর জায়গা কোথায় ঠিক হবে দেখতে গেলুম। নদীর ধার থেকে গ্রাম একটু দূর হ'লেও গ্রামের মেয়েরা নদীতেই জল নিতে আসে। আমাদের যেখানে নৌকোখানা বাঁধা হয়েছিল, তার বাঁ-ধারে খানিকটা দূরে মাটিতে ধাপ-কাটা কাঁচা ঘাট। গ্রামের একজন বৃদ্ধ বোধ হয় নদীতে গ্রীষ্মের দিনের বৈকালে স্নান করতে আসছিলেন, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম রসুলপুর কোন্ গাঁ-খানার নাম মশাই ? সামনের এটা, না ওই পাশে ?

তিনি বললেন—আজ্ঞে না, এটা হ'ল কুমুরে, পাশের ওটা আমডাঙ্গা—রসুলপুর হ'ল এ গাঁ-গুলোর পেছনে, কোশ দুই তফাত—আপনারা ?

আমাদের পরিচয় শুনে বৃদ্ধ বললেন—এই মাঠটাতেই আপনারা তাঁবু ফেলবেন? আপনাদের জরিপের কাজ শেষ হতেও তো পাঁচ ছয় মাস....

আমরা বললুম—তা তো হবেই, বরং তার বেশী....

বৃদ্ধ বললেন—এখানটা একটা ঠাকুরের স্থান, গাঁয়ের মেয়েরা পুজো দিতে আসে, বরং আর একটু সরে গিয়ে নদীর মুখের দিকে তাঁবু ফেলুন, নইলে মেয়েদের একটু অসুবিধে....

বৃদ্ধের নাম ভুবন চক্রবর্তী। জরিপ আরম্ভ হয়ে গেলে নিজের দরকারে চক্রবর্তী মশায় দলিল-পত্র বগলে অনেকবার তাঁবুতে যাতায়াত শুরু ক'রে দিলেন, সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ মেশামেশি ও আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর পৈতৃক জমা-জমি অনেকে নাকি ফাঁকি দিয়ে দখল করেছে, আমাদের সাহায্যে এবার যদি সেগুলোর একটা গতি হয়—এই সব ধরনের কথা তিনি আমাদের প্রায়ই শোনাতেন।

আমি সেখানে বেশীদিন ছিলুম না। খানাপুরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমি সেদিনই জেলায় ফিরব—জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা ছাড়তে দেরী হ'তে লাগল। চক্রবর্তী মশায়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, এটাকে বউ-চণ্ডীর মাঠ বলে কেন চক্কত্তি মশাই ? আপনাদের কি কোন....

নৃপেনবাবুও বললেন—ভাল কথা, বলুন তো চক্কত্তি মশাই, বউ-চণ্ডী আবার কি কথা—শুনিনি তো কখনো !

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্তী মশায়ের মুখে একটা অদ্ভুত গল্প শুনলুম। তিনি বলতে লাগলেন—শুনুন তবে, এটা সেকালের গল্প। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে শোনা। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন লোকে এ গল্প জানে।

সেকালে এ গ্রামে এক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করতেন। এখন আর তাদের কেউ নেই, তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় তাদের বড় শরিক পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয়ের খুব নামডাক ছিল।

এই পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয় যখন তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনলেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। এমন যে বিশেষ বয়স তা নয়, বিশেষতঃ ভোগের শরীর—পঞ্চাশ বছর বয়স হ'লেও চৌধুরী মহাশয়কে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখাত। বউ দেখে বাড়ীর সকলেই খুব সন্তুষ্ট হ'ল। তৃতীয় পক্ষের বউ বলে চৌধুরী মশায় একটু ডাগর মেয়ে দেখেই বিয়ে করেছিলেন, নতুন বউয়ের বয়স ছিল প্রায় সতেরোর কাছাকাছি। বউয়ের মুখের গড়নটি বড় সুন্দর, মুখের ছাঁচ যেন হরতনের টেক্কাটির মত। চোখ দুটি বেশ ডাগর, ভাসা ভাসা মুখে চোখে ভারি একটা শান্ত ভাব। নতুন বউয়ের কাজ-কর্ম আর ধীর শান্ত ভাব দেখে পাড়ার লোকে বললে, এ রকম বউ এ গাঁয়ে আর আসেনি। সে মাটির দিকে চোখ রেখে ছাড়া কথা বলে না, অল্প বয়সের খুড়-শাশুড়ী দলের সামনেও ঘোমটা দেয় ; সকলে বললে, যেমন লক্ষ্মীর মত রূপ তেমনই গুণ।

মাস দুই-তিন পরে কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘটল। সকলে দেখলে বৌটির আর সব ভাল বটে, একটা কিন্তু বড় দোষ। সে কিছুতেই স্বামীর ঘেঁষ নিতে চায় না, প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়। প্রথম প্রথম সকলে ভেবেছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে, ছেলেমানুষ, বোধহয় সেই জন্যই এ রকম করে ! ক্রমে কিন্তু দেখা গেল, যে কোন পুরুষমানুষ দেখলেই সে কেমন ভয়ে কাঁপে। বাড়ীতে যেদিন যজ্ঞি কি কোন বড় কাজ-কর্মে বাইরের লোকের ভিড় হয়, সেদিন সে ঘর থেকে আর বারই হয় না। স্বামীর ঘরে কিছুতেই তো যেতে রাজী হয় না, মাসে দু'দিন কি একদিন সকলে আদর ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে পাঠাতে যায়, সে জনেজনের পায়ে প'ড়ে, এর-ওর কাছে কাকুতি-মিনতি ক'রে, কিছুতেই বুঝ মানে না। পুরুষমানুষের গলার স্বর শুনলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকলে তাকে একদিন স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দোরে শিকল বন্ধ করে দিল। চৌধুরী মশায় অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এর পর আর কিছুতেই কোন দিন সে স্বামীর ঘরে যেতে চাইত না, বাড়ীসুদ্ধ লোকের হাতে পায়ে প'ড়ে বেড়াতে লাগল ; সকলকে বলে—আমার বড্ড ভয় করে, আমায় ওরকম ক'রে আর পাঠিও না ....তোমাদের পায়ে পড়ি।...

বোঝাতে বোঝাতে বাড়ীর লোক হয়রান হয়ে গেল ।

দিনকতক গেল, একদিন তাকে সকলে মিলে জোর ক'রে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বার থেকে দোর বন্ধ করে দিলে। তারা ঠিক করলে এই রকম দিতে দিতে ক্রমে লজ্জা ভাঙ্গবে-নইলে কতদিন আর এ ন্যাকামি ভাল লাগে?....ভোরে উঠে সকলে দেখলে ঘরের মধ্যে বউ নেই, বাড়ীর কোথাও নেই। নিকটেই বাপের বাড়ীর গাঁ, সেখানে পালিয়ে গিয়েছে ভেবে লোক পাঠানো গেল। লোক ফিরে এল, সে সেখানে যায়নি। তখন সকলে বললে—পুকুরে ডুবে মরেছে; পুকুরে জাল ফেলা হয়, কোন সন্ধান মেলে না। বউয়ের কচি মুখের ও নিরীহ চোখের ভাব মনে হয়ে লোকের মনে অন্য কোন সন্দেহ জাগবার অবকাশ পেল না। কত দকিে কত সন্ধান ক'রে যখন কোন খোঁজই মিলল না, চৌধুরী মশায় মানসিক শোক নিবারণ করবার জন্যে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ঘরে আনলেন।

অজ পাড়া-গাঁ, নতুন কিছু একটা বড় ঘটে না, অনেকদিন এটা নিয়ে নাড়া-চাড়া চলল, তারপর ক্রমে সেটা কেটে গিয়ে গ্রাম ঠান্ডা হ'ল। এই মাঠের পুবধারে গ্রামের মধ্যেই চৌধুরীদের বাড়ী ছিল। তখন এইখান দিয়েই নদীর স্রোত বইত—ম'জে বাঁওড় হয়ে গিয়েছে তো সেদিন, আমরা ছেলেবেলাতেও ধান বোঝাই নৌকা চলাচল

হ'তে দেখেছি। ক্রমে চৌধুরীদের সব ম'রে হেজে গেল, শেষ পর্যন্ত বংশে একজন কে ছিল উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বাস করলে। এ সব অনেক বছর আগেকার কথা, সত্তর-আশির বছর খুব হবে। সেই থেকে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সব মাঠে বড় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে শোনা যায়।

এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন খুব গরম পড়ে, তখন রাখালেরা গরু চরাতে এসে দূর থেকে কতদিন দেখেছে, মাঠের ধারে বনের মধ্যে নিভৃত দুপুরে বাঁশবনের ছায়ায় কে যেন শুয়ে আছে, কাছে গেলে কেউ কখনো দেখতে পায়নি।...কতদিন সন্ধ্যার সময় তারা গরুর দল নিয়ে গ্রামের মধ্যে যেতে যেতে শুনেছে, অন্ধকার ঝোপের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্নার রব উঠছে।....সমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে অনেকে নদীর ঘাট থেকে ফেরবার পথে ছাতিম গাছের নীচু ডালের তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছে, দূর মাঠে সন্ধ্যার আব্‌ছায়া জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে সাদা কাপড় পরে কে যেন ক্রমেই দূরে চ'লে যাচ্ছে— তার সমস্ত গায়ের সাদা কাপড়ে জ্যোৎস্না প'ড়ে চিক্‌মিক্ করতে থাকে।....মাঠে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন ফুলেভরা নাগকেশর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখলে মনে হয়, কে খানিকটা আগে এখানে দাঁড়িয়ে ডাল নীচু করে ফুল পেড়ে নিয়ে গিয়েছে....তার ছোট ছোট পায়ের দাগ, ঝোপ যেখানে বড় ঘন সেদিকেই চ'লে গিয়েছে ।....

মাঠের ধারে এই ছাতিম গাছের তলায় উলোচণ্ডীতলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রাম-বধূরা পিঠে, কাঁচা দুধ আর নতুন আখের গুড় নিয়ে বউ-চণ্ডীর পুজো দিতে আসে। বউ-চণ্ডী সকলের মঙ্গল করেন, অসুখ হ'লে সারিয়ে দেন, নতুন প্রসূতির স্তনে দুধ শুকিয়ে গেলে, ওঁর কাছে পুজো দিলে আবার দুধ হয়। কচি ছেলের সর্দি সারে, ছেলে বিদেশে থাকবার সময় চিঠি আসতে দেরী হ'লে পুজো মানত করবার পরই শীগ্‌গির সুসংবাদ আসে। মেয়েদের বিপদে-আপদে তিনিই সকলকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করে থাকেন।....।

চক্রবর্তী মহাশয়ের গল্প শেষ হ'ল। তারপর আরও নানা কথাবার্তার পর তিনি ও আর সকলে উঠে চ'লে গেলেন।

বেলা বেশ প'ড়ে এসেছে। সন্ধ্যার বাতাসে ছাতিম বনে সুর্ সুর্ শব্দ হচ্ছে। গ্রামের মাঠটা অনেকদূর পর্যন্ত উঁচু-নীচু ঢিবি আর ঘেঁটু ফুলের বনে একেবারে ভরা। বাঁ দিকে দূরে একটা পুরনো ইঁটের পাঁজার খানিকটা ঘন জিউলি গাছের সারির মধ্য দিয়ে চোখে পড়ে।

নৌকোর গলুই-এ ব'সে আসন্ন সন্ধ্যায় আশী বছর আগেকার পলাতকা গ্রাম্য-বধূর ইতিহাসটা ভাবতে লাগলুম। মাঠের মাঝে উঁচু ঢিবির ওপরকার ঘেঁটু ফুলের ঘন বনের দিকে চেয়ে মনে হল যে—সারা দিনমান সে হয়ত ওর মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে, কেবল গভীর রাত্রে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে, মাঠের মধ্যের বটগাছের তলায় চুপ ক'রে ব'সে আকাশের তারার দিকে চায়।....পাশের ঝোপের ফুটন্ত বন-অপরাজিতা ফুলের রং-এর সঙ্গে রং মিলিয়ে নদী ব'য়ে যায়....ছাতিম বনের পাখীরা ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে ওঠে—ওপার থেকে হুহু করে হাওয়া বয়....সে ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে পুব দিকে চেয়ে দেখে ভোরের আলো ফোটবার দেরী কত !....

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বনের ওপর নবমীর চাঁদ উঠল। একটু পরেই জোয়ার পেয়ে আমাদের নৌকা ছাড়া হ'ল। জলের ধারের আঁধার-ভরা নিভৃত ঝোপের মধ্য থেকে সত্যিই যেন একটা চাপা কান্নার রব পাওয়া যাচ্ছিল— সেটা হয়ত কোন রাত-জাগা বনের পাখীর, কি কোন পতঙ্গের ডাক।

বাঁওড়ের মুখ পার হয়ে যখন আমরা বাইরের নদীতে এসে পড়েছি, তখন পিছন ফিরে চেয়ে দেখি নির্জন গ্রামের মাঠে সাদা কুয়াসায় ঘোমটা দেওয়া ঝাপসা জ্যোৎস্না রাত্রি অল্পে অল্পে লুকিয়ে চোরের মত আত্মপ্রকাশ করছে, অনেককাল আগেকার সেই লজ্জা-কুণ্ঠিতা ভীরু পল্লীবধূটির মত !....